বাংলার পুতুল-শিল্প ও তার শিল্পীরা

প্রবীর সেন

পুতুল বলতেই প্রথমে মনে পড়ে মেলার কথা। বাঙলাদেশে খুব কম মেলাই আছে যেখানে পুতুল পাওয়া যায় না। হালফিলের আধুনিক মেলার কথা বাদ দিলে দেখা যাবে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সমস্ত মেলার সঙ্গেই পুতুলের একটা নাড়ীর যোগ।

পূজা-পার্বণের সঙ্গে মেলার যেমন যোগ তেমনি মেলার সঙ্গে পুতুলেরও একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দুটির যোগ অঙ্গাঙ্গি।

ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণকে উপলক্ষ করে স্মরণাতীত কাল থেকেই নানা উৎসব, নানা মেলা। কথায় বলে, বারো মাসে তেরো পার্বণ। অর্থাৎ সারা বছর ধরেই চলছে এইসব উৎসব আর অনুষ্ঠান। বৈশাখ থেকে চৈত্র অবধি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মত মেলা হয়। তার মধ্যে বেশির ভাগই ধর্মীয় মেলা। যেমন রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, চড়ক, দোল, করম, রঙ্কিনী, চণ্ডী, মনসা, মহরম, ইদুজ্জোহা, পীর, গাজী, উরুস। আরও' কত কী।

বর্ষা এবং গ্রীষ্মে মেলার সংখ্যা আনুপাতিক হারে কিছুটা কম। শরৎ হেমন্ত শীত এবং বসন্ত এই সময়টাই মেলার সংখ্যা অনেক বেশি। ভাদ্রসংক্রান্তি, বিশ্বকর্মা পূজা ও অরন্ধন থেকে চৈত্র সংক্রান্তির গাজন পর্যন্ত অনুষ্ঠানের শেষ থাকে না। এইসব মেলাকে কেন্দ্র করে কুম্ভকারদের অনেক কিছু নির্ভর করে। এমন অনেক অঞ্চল আছে যারা সংবৎসরের মাটির হাঁড়ি-কড়া মেলা থেকেই কিনে রাখেন।

উৎসব বা পালা পার্বণ বাঙালীর জীবন-শক্তিকে যেমন অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তেমনি বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের এই প্রাচীন লোকশিল্পের ধারা। এই মেলায় এখনও এমন পুতুল পাওয়া যায় যার কাল নির্ধারণ করতে গেলে দেখা যাবে তা আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসারী।

বহু বছর ধরে চলে আসছে আমাদেরই এই লোকশিল্প। বিভিন্ন অঞ্চলে এসে এখানকার জল মাটি আর জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে এক একটা আঞ্চলিক রূপ নিয়েছে। কোথাও সেই ধারার সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি, আবার কোথাও এত বেশি পাল্টে গেছে যা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোন মিল নেই।

হরপ্পা-মোহেনজোদারোর 'মাদার গডেসের' সঙ্গে পাঁচমুড়ার মা-পুতুল বা ষষ্ঠী পুতুলের মিল পাওয়া যায় অনেক। বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের পোড়া মাটির পুতুলের গড়নের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন রীতি পরম্পরা চলে আসছে। পাখির মত দেখতে বাঁশি, মাটির গরুর গাড়ি, নারী মূর্তি যার সঙ্গে এখানকার পুতুলের পার্থক্য খুব কম।

বাঙলার পুতুল প্রসঙ্গে যেমন মেলার কথা চলে আসে তেমনি চলে আসে এখানকার কুমোর সমাজের কথা। আঞ্চলিক দেবদেবী বা পৌরাণিক দেবদেবীর কথা। এইসব পুতুল যদি বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভাগ করি তাহলে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। দেবদেবীর মূর্তি, পশুপাখির মূর্তি অথবা নারী মূর্তি।

পৌরাণিক মূর্তির মধ্যে যেমন রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, গণেশ, গণেশজননী। আবার আঞ্চলিক দেবদেবীদের মধ্যে আছেন ষষ্ঠী, দক্ষিণরায় বাবা, বনবিবি, আটেশ্বর, ওলাই চণ্ডী, বড়খাঁ গাজী, টুসু-ভাদু, করম, সিনি, সত্যপীর ইত্যাদি। পশুপাখিদের মূর্তির মধ্যে বেশিরভাগ দেবদেবীদের বাহন যেমন ইঁদুর, পেঁচা, সাপ, গরু, বেড়াল ইত্যাদি। তাছাড়া আছে ছোটদের জন্য ভল্লুক, বাঁদর, মাছ মুখে নিয়ে বেড়াল ও বাঘ; নারী মূর্তির মধ্যে আছে মা ও ছেলে, বেনেবৌ, কলসি কাঁখে বউ, গোয়ালিনী, ইত্যাদি।

বর্তমানে অনেক পৌরাণিক বা লৌকিক দেবদেবী পুতুল হিসেবেই দেখা হয়। এইসব পুতুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আকৃতি এবং ছন্দ। পৌরুষ ও সরলতা। অল্প কিছু রেখা বা আঁচড় দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে শক্তি এবং 'ডায়নামিজম'।

বাঁশের পুতুল : পেঁচা

যাঁরা এই ধরনের মাটির টেপা পুতুল তৈরি করেন তাঁদের গঠনের মধ্যে প্রিমিটিভ কোয়ালিটি এখনও বর্তমান আছে। এদের ফর্মগুলো গ্রোটেস্ক কিন্তু তার মধ্যে একটা গতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন ট্র্যাডিশনাল শিল্পীরা হাত পা এবং শরীরের বিশেষ কোন অংশ রিয়্যালিস্টিক্যালি দেখায় না। একটা মোটা লাইন অথবা কার্ভ লাইন দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন। কোন ছাঁচের ব্যবহার নেই। শরীরে কয়েকটা অংশ আলাদা ভাবে মাটির ডেলা জুড়ে তৈরি করা হয়। নরম অবস্থায় বাঁশের চেঁচাড়ি অথবা সরকাঠি দিয়ে নানা রকম নকশা আঁকা হয়। লম্বায় এই পুতুল আড়াই ইঞ্চি থেকে ছয় সাত ইঞ্চির মধ্যে হয়।

নব্যপ্রস্তর যুগের এই প্রাচীনতম মৃৎশিল্পের ধারা মহিলাদের মধ্যে এখনও টিকে আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন এই মৃৎশিল্পের বিপ্লব সর্বপ্রথম মহিলারাই করেন। বাঙলাদেশেও সেই একই ধারা! রোজকার গৃহস্থালীর পর অবসর সময়ে এঁরা পুতুল গড়েন। কখনও দেবদেবীর মূর্তি, কখনও সামাজিক বিষয় নিয়ে। যেমন গম-পেষানী, উকুন বাছানী ইত্যাদি। শুধু যে কুম্ভকারদের মেয়ে বৌ-রাই এই সব পুতুল গড়েন তা নয়, অন্যান্য ঘরের মহিলারাও পুতুল তৈরি করেন। এইসব পুতুল বেশির ভাগ গার্হস্থ্য উৎসব বা ব্রতের জন্য।

এক সময়ে যাঁরা হাঁড়ি-কলসি তৈরি করেতেন তাঁরাই একদিন মৃৎশিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অবশ্য সকলেই যে হতে 'পেরেছেন তা নয়, এমনও দেখা যায় যাঁরা প্রাচীন কাল থেকে এখনও পর্যন্ত হাঁড়ি-কলসির কাজ করে আসছেন। এছাড়া নমশূদ্ররাও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে সূত্রধর গোষ্ঠীর লোকেরাও মূর্তি তৈরি করেন। বাঙলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এই গোষ্ঠীর শিল্পীদের দেখতে পাওয়া যায়। আবার এমনও দেখা যায় উপাধিতে কুম্ভকার অথচ তাঁরা কোন দেবদেবীর মূর্তি করেন না। পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা পুতুল এবং হাঁড়ি-কলসি তৈরি করেন। পাল উপাধিরাও এই কাজ করেন। বিশেষ করে কলকাতা, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদে এঁদের দেখতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীদের বংশগত উপাধি হল দাস, খাঁ, পাল, প্রামাণিক, পাত্র, সন্ন্যাসী, বারিক কুণ্ডু।

পাঁচমুড়ার শিল্পীরা আবার চারটি উপজাতিতে বিভক্ত—রাঢ়ী চৌরাঢ়ী খোট্টা, মগয়া। উপজাতিগুলোর অর্থ বৃত্তগত আবার স্থানগত।

যেমন খোট্টা হল বিহারী, মগয়া হল মগধের বাসিন্দা। অশোক মিত্র তাঁর 'দ্য ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব ওয়েস্টবেঙ্গল' বইতে কুম্ভকারদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। কুচল, হাদ্মর আর দেওরা। কুচল তৈরি করেন ছোট ছোট মাটির পাত্র—খুরি, ভাঁড়, পিলসুজ, প্রভৃতি। হাদ্মর তৈরি করেন বড় বড় মাটির পাত্র, যেমন গরুকে খাওয়ানোর মেছলা, কলসি, জালা। আর দেওরা শ্রেণী দেবদেবীর মূর্তি।

বাঙলার টেরাকোটা মন্দিরগুলোর অলংকরণ করেছিলেন সূত্রধর গোষ্ঠীর শিল্পীরা। তাঁরা ছিলেন পাল, দে, দত্ত, সাঁই, বর্ধন, মাইতি, কুণ্ডু, শীল ইত্যাদি। এঁরা সাধারণত কাঠ, মাটি ও পাথর দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি করতেন। যেমন কারুকার্য করা জানলা দরজার কপাট, বৃষকাঠ গরুর গাড়ি, মন্দির, রথ এবং দেবদেবীদের মূর্তি। বাঙলার বেশির ভাগ পাথরের মূর্তি দাঁইহাটের

টেরাকোটা : কুকুর
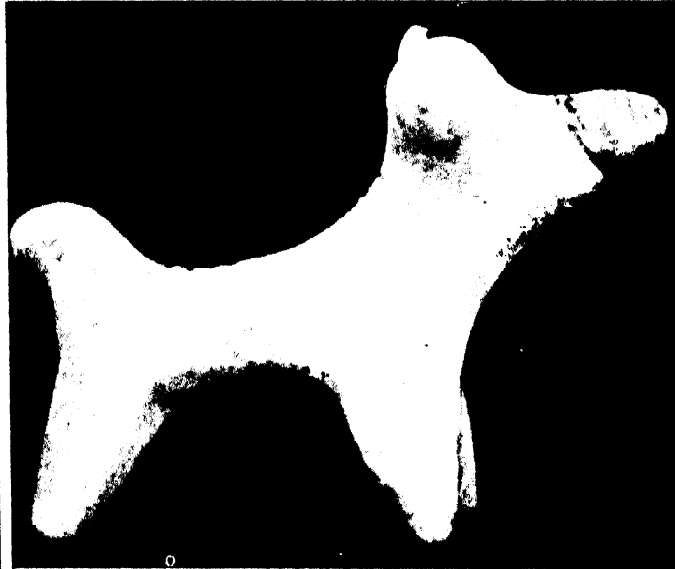
সূত্রধররা তৈরি করেছিলেন। বর্ধমানের নতুন গ্রামে এখনও কয়েকঘর সূত্রধর পরিবার কাঠের পুতুল তৈরি করেন।

কুম্ভকারদের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা পুরান কাহিনী প্রচলিত আছে। তাতে বলা হয়েছে মহাদেব এই কুম্ভকারদের সৃষ্টি করেন। চড়ক সংক্রান্তির দিন নীলবতী দুর্গার সঙ্গে মহাদেবের বিয়ে হবে, এমন সময় চারটে মঙ্গলঘটের দরকার হল। কিন্তু কোথাও তা পাওয়া গেল না। তখন মহাদেব সূত্রধরদের সৃষ্টি করলেন। যাঁর নাম রুদ্রপাল। রুদ্রপালের বংশ রক্ষার জন্য দুর্গা সৃষ্টি করলেন তাঁর স্ত্রীকে। তাঁকে দেখতে অবিকল দুর্গার নিজের মত। সেই দেখে রুদ্রপাল অবাক হলেন। এ মহা বিপদ, নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারেন না। মহাদেব তখন ঠিক করলেন রুদ্রপালের স্ত্রীর নাকে নাকছাবি, মাথায় টিকলি থাকবে না। তাতেই রুদ্রপাল পার্থক্য করতে

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রীতিতে পুতুল তৈরী হয় ▲
পুতুল তৈরী করেন 'দেওরা' শ্রেণীর কুম্ভকারেরা ▼

পারলেন নিজের স্ত্রীকে। আজও এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা কেউ মাথায় বা নাকে কোন রকম গহনা পরেন না। সেই জন্য বাঙালী কুম্ভকারদের উপাস্য দেবতা বিশ্বকর্মা নন। এঁদের উপাস্য দেবতা শিব। বৈশাখ মাসে রাঢ় অঞ্চলের কুম্ভকারেরা চাকের উপর শিবমূর্তি বসিয়ে রাখেন। পুরো মাস তাঁরা কোন রকম মাটির কাজ করেন না।

বারো মাস ফল ধরে একমাস মানা।
যতগুলি ফল ধরে ততগুলি কানা॥

বর্তমানে পশ্চিমবাঙলায় কুম্ভকারদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বা বর্ণবিভাগ নিয়ে তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নেই। হাঁড়ি-কলসি বা দেবদেবীর মূর্তি এখন সব গোষ্ঠীর কুম্ভকাররা অল্পবিস্তর করে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রীতিতে পুতুল তৈরি হয়। কোন কোন অঞ্চলের বিশেষত্ব হল মাটির পুতুল, আবার কোথাও-বা কাঠের পুতুল-এ ছাড়া আছে পাতা শোলা আর গালার পুতুল।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর লোকশিল্প প্রবন্ধে লিখেছেন, "কৃষিজীবী সমাজের কারিগররা হাতের কাছে যে সব উপকরণ পেয়েছিলেন সেগুলিকেই ব্যবহার করেছিলেন রূপ নির্মাণের জন্য। এই কারণে মাটি, কাঠ এই দুটিকে লোকশিল্পের প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। তার সঙ্গে এসেছে কড়ি, দড়ি, বেত, বাঁশ, ঘাস, কাপড়, কম্বলের টুকরো ইত্যাদি সহজলভ্য বস্তু। মোট কথা ভারতীয় লোকশিল্পের পরম্পরা ধারণ করে আছে কাঠ ও মাটি। বলা বাহুল্য, এই দুইটি উপকরণ অতি প্রাচীন। এই কারণে মাটি ও কাঠে নির্মিত নিদর্শনগুলিতে প্রাচীনত্বের ছাপ অনুসন্ধান করা হয়তো নিরর্থক হবে না। বিশেষ ভাবে জীবজন্তুর মধ্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রথম শতাব্দীর প্রস্তর উৎকীর্ণ মূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। এই প্রসঙ্গে ভরুতের বানর ও লোকশিল্পীর হাতে গড়া মাটির বা কাঠের বানরের তুলনা করা যেতে পারে।"

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের মধ্যে প্রধান হল মাটির পুতুল। এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে সমস্ত পোড়া মাটির পুতুল পাওয়া যায় তাদের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব স্থানীয় রীতি আছে। প্রত্যেকটার সঙ্গে চরিত্রগত কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

বাঁকুড়ার সমস্তটা জুড়ে আছে সিনি উপাধির দেবতা। সিনি হলেন দেবী। তিনি গ্রাম রক্ষয়িত্রী, শস্যদাত্রী, দয়াবতী বৃদ্ধা। তাঁকে তুষ্ট করতে পারলে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সিনি দেবীর কোন মূর্তি নেই। এঁর প্রতীক হিসাবে পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি। ইনি সর্বত্রই গাছের তলায় থাকেন। এই দেবীকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে পূজা করেন না। এঁর পূজা গ্রামগতভাবেই হয়। সিনি দেবীর পুজো হয় পয়লা মাঘ। কোথাও মকর সংক্রান্তিতে। কোন বড় গাছের তলায় সিনি দেবীর থান থাকে, পূজার সময় গ্রামবাসীরা এসে পোড়া মাটির ঘোড়া হাতি ঐ থানে রাখেন। কোন কোন জায়গায় সিনিকে 'সুনি'ও বলা হয়। এটা হয়তো সুনিয়া শব্দের অপভ্রংশ। সুনিয়া শব্দের

অর্থ 'আদি'। বিনয় ঘোষ তাঁর রাঢ়ের মৃৎশিল্প প্রবন্ধে লিখেছেন—"বস্তুত বাঁকুড়ার এই প্রাচীন গ্রাম্য দেবস্থানগুলিই আমার কাছে বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের আদি ও অকৃত্রিম মিউজিয়াম বলে মনে হয়েছে। হাতি ঘোড়া দেবস্থানে মানত ও উৎসর্গের জন্য দেওয়া হয়, তাই বংশানুক্রমে উৎসর্গীত হাতি-ঘোড়ার স্তূপ প্রত্যেক দেবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো হাতি-ঘোড়া এই সব দেবস্থানে দুর্লভ নয়, শতাধিক বছরের প্রাচীন নিদর্শনও দেবস্থানের আশপাশের মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায়। পুরনো হাতি-ঘোড়ার ভঙ্গি, গড়ন ও কারুকার্য অন্য রকমের। কাজেই যাঁরা বাঁকুড়ার এই মৃৎশিল্পের স্টাইল ক্রমবিকাশের বিশেষ অনুশীলন করতে চান, তাঁদের বাঁকুড়ার প্রাচীন গ্রাম্য দেবস্থানে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

বিষ্ণুপুরে যে সমস্ত গ্রামে এই ধরনের মাটির পুতুল পাওয়া যায় তাদের মধ্যে পাঁচমুড়ার শিল্পীরা বেশি কুশলী। পাঁচমুড়ার প্রভাব আশপাশের অনেক গ্রামের উপর পড়েছে। আবার সোনামুখী, হামীরপুর ও রাজগ্রামের স্টাইল-এর সঙ্গে পাঁচমুড়ার বিশেষ কোন মিল নেই। সোনামুখীর ঘোড়ার গলা পাঁচমুড়ার থেকে লম্বায় কম। কান অনেকটা রিয়্যালিস্টিক। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার মত মাথা থেকে কান আলাদা করা যায় না। ল্যাজ ও কান দেহের সঙ্গে লাগানো থাকে। পাঁচমুড়ার ঘোড়ার কান পাতলা, বাঁশ পাতার মত। এদের ঘাড়ের কাছে লাগাম থাকে। এদের চোখের সঙ্গে মুরলুর ঘোড়ার মিল পাওয়া যায়। সোনামুখীর পুতুলের গড়ন অনেকটা গোল। এদের দেহে অনেক বেশি অলংকার থাকে। চোখ আঁচড় দিয়ে আঁকা। লেজ স্বাভাবিক।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে শালতোড়া থানায় মুরলু গ্রাম। এখানকার ঘোড়ায় এখনও কোন রকম আধুনিকতার ছাপ পড়েনি। অনেকের ধারণা বাঁকুড়ার ঘোড়ার যে ঘরানা তার সূচনা প্রথমে এখান থেকে শুরু হয়। মুখ নাক কান আঙুলে টিপে তৈরি। বাঁকানো গলা। ঘাড়ের দু'দিকে সামান্য নকশা থাকে।

এখানকার আরো একটা নিদর্শন হল মনসার ঘট, মনসার ঝাড় বা চালি। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় যে সমস্ত মনসার ঘট পাওয়া যায় তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। একটা ঘটের উপরে অর্ধবৃত্তাকারে সাপের ফণা পর পর সাজানো থাকে। ঘোড়া বা হাতির মত এই মনসার চালি একটা অনবদ্য মূর্তি।

কুম্ভকাররা চাক ঘুরিয়ে যে-ভাবে ঘট, খুরি, গেলাস তৈরি করেন, ঠিক সেই ভাবেই চাক ঘুরিয়ে তৈরি করেন ঘোড়ার পা, মাথা, দেহ প্রভৃতি অংশ। ভেতরটা থাকে ফাঁকা। এমনভাবে তৈরি যে প্রত্যেকটা অংশ জুড়ে নেওয়া যায়। আঙুলে টিপে টিপে মুখের আদল আনা হয়। চোখ, লাগাম এবং শরীরের অলংকার আলাদা মাটির বেড়ি দিয়ে তৈরি হয়। বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে আঁচড় কেটে সেগুলোয় যথাযথ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। কাঁচা মূর্তিগুলো প্রথমে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে তার উপর হলুদ

মমি পুতুল

বাঁকুড়ার পুতুলের মধ্যে পাঁচমুড়ার মা-পুতুল একটা বিস্ময়কর শিল্প নিদর্শন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই মা-পুতুলের প্রপিতামহী ছিলেন সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারোয় পশু আকৃতির মাতৃকা দেবী।

টেপা পুতুল
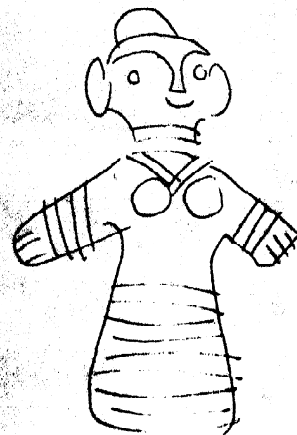
রং-এর একটা প্রলেপ লাগিয়ে নেওয়া হয়। যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'বনক' বা 'বেলি-বনক'। এর পর পণ সাজিয়ে ভাটিতে শুকনো খড় পাতা জ্বালানো হয়। প্রথম দফা পোড়ানোর ফলে পোড়া মাটির লাল রং যথাযথভাবে ফুটে ওঠে। যে-গুলো কালো করার প্রয়োজন, সেগুলো ভাটিতে দেওয়া হয় আর একবার। দ্বিতীয় বারে যথেষ্ট পরিমাণে ঘুঁটে ব্যবহার করা হয় এবং যাতে ঘুঁটের ধোঁয়া কোন ফাঁক বা ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে না যায় তার জন্য সমস্ত পথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার ফলে দ্বিতীয় দফায় মূর্তিগুলো দেখতে হয় কালো কষ্টি পাথরের মত।

বাঁকুড়ায় এক সময় বাঘের মূর্তিও তৈরি হত। বড়ামদেবীর প্রতীক বা ছলন দেবার জন্য। এই বড়ামদেবী আদিবাসী সাঁওতাল, লোধা, মহালী এবং বাউড়ী প্রভৃতি জাতির উপাস্য দেবতা। বড়াম দেবতার জন্য বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পীরা বেশ কিছু উপার্জন করেন। লোধাদের বিশ্বাস বড়াম পশুপাখির দেবতা। যখন ঐ অঞ্চলে ঘন জঙ্গল ছিল—বাঘ ও বন্য হাতিদের আক্রমণ থেকে এই দেবীই রক্ষা করতেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'বারা' এবং বড়ামের অনেকটা মিল। উভয়েই ব্যাঘ্র দেবতা।

বাঁকুড়ার পুতুলের মধ্যে পাঁচমুড়ার মা-পুতুল একটা বিস্ময়কর শিল্প নিদর্শন। বাড়ির বৌ-রা অবসর সময় নরম মাটি দিয়ে আঙুলে টিপে টিপে তৈরি করেন এই পুতুল। সাধারণত এই পুতুল রোদে শুকানো বা পোড়া মাটির হয়।

পাঁচমুড়ার মা-পুতুল প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই মা-পুতুলের প্রপিতামহী ছিলেন সিন্ধু উপত্যকার মহেনজোদারোর পশু আকৃতির মাতৃকা দেবী। মাটির তলা থেকে যে সমস্ত মাতৃকা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই দাঁড়ানো মূর্তি।

এদের মধ্যে কারো কোলে সন্তান আবার কারো মধ্যে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা যায়। কোমরে মেখলা, গলায় হার, মাথায় ঘন চুল।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মাতৃপূজার প্রথম প্রচলন হয়েছিল নিপ্পারে। আবার কেউ বলেন আনাটোলিয়ায় অথবা সিরিয়ায় এর উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেখান থেকে ক্রমশ মেসোপটেমিয়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দ্রাবিড় নারীদের মাতৃদেবীকে আর্যরাও তাদের নিজের করে নিয়েছিলেন। আজও ইনি হিন্দু নারীদের কাছে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে অরণ্য ষষ্ঠী দেবী নামে পূজিত হন।

বাঁকুড়ায় অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির রাত থেকে টুসুর পূজা বা উৎসবের শুরু হয়। সারা পৌষ মাস ধরে চলে। ভাদুর পূজা হয় ভাদ্র মাসে। এই পূজা উপলক্ষে এখানে টুসু ও ভাদুর মাটির তৈরি মূর্তি পাওয়া যায়। টুসুর গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় রাংতার মুকুট, পরনে লাল রঙের শাড়ি বা ঘাগরা। সারা অঙ্গে শোলার এবং রঙিন কাগজের তৈরি গহনা। মাথার পিছনে ফুলকাটা চালচিত্র। টুসুদেবীর সব সময় দাঁড়ান মূর্তি হয়।

ভাদুর গায়ের রঙ হলুদ, টানা টানা চোখ, মাথায় মুকুট। পরনে শাড়ি অথবা ঘাগরা। ভাদুর

এক হাতে সন্দেশ বা নাড়ু, অন্য হাতে ধানের শিষ কিংবা পান।

টুসু-ভাদুর মূর্তি বীরভূম ও পুরুলিয়াতেও পাওয়া যায়। গান হল উৎসবের প্রধান এবং একমাত্র অঙ্গ। সূত্রধরগোষ্ঠীর শিল্পীরা এই মূর্তি তৈরি করেন।

বাঙলাদেশে কৃষ্ণনগরের পুতুলের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। বহু গান, কবিতা এবং ছড়ায় তার উল্লেখ আছে। বাসরঘরে জামাইকে ঠকানো হোত কৃষ্ণনগরের পুতুল দিয়ে। দেখলে আসল না নকল সহজে বোঝা যেত না। যেমন রুই-কাতলা, চিংড়ি মাছ, আরশোলা, টিকটিকি। নিমকী, সিঙাড়া, পানতুয়া। কলা, শসা, আম, পেঁপে, কাটা তরমুজ, পাকা ফুটি ইত্যাদি। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের ঐতিহ্য মাত্র দুশো বছরের। শুরুতে এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জমিদার এবং ইংরেজরা। এঁদের উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ফলে সেই সময়ে বেশ কিছু উন্নতমানের কাজ হয়েছিল। এঁরা দক্ষ ছিলেন, 'ন্যাচারাল মডেলে'। হুবহু নকল করে এঁরা তৈরি করতেন মাটির ছোট ছোট মডেল। যেমন পুরনো বাড়ি, পানসি নৌকো, বাঘ শিকারী, খানসামা, আয়া, ছোট ডিঙ্গি, ভিস্তি, দরজি, ধোপা, কুলি, ফকির ইত্যাদি।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির কোন মিল নেই। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের পুতুল বা মূর্তির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়

সোনামুখীর ঘোড়া

এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে তৈরি।

নবদ্বীপ বা শান্তিপুরের তুলনায় কৃষ্ণনগর শহর অনেক পরে তৈরি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় এখানকার শহরের গৌরব এবং প্রসার ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। তার আগে এখানে ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো। রাজার হাতেই ছিল শাসন ক্ষমতা। কৃষ্ণনগরের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক। এই রাজবংশের অন্যতম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন উন্নতমনস্ক এবং শিল্পরসিক। আলীবর্দীর সময় থেকে মীরজাফরের সময় পর্যন্ত তাঁর খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল।

জনশ্রুতি আছে তিনি প্রথম বাঙলাদেশে কালীপূজা এবং জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজার প্রবর্তন করেন। তার ফলে দেবমূর্তি গঠনের রেওয়াজ এখানকার কুম্ভকারদের মধ্যে শুরু হল।

কৃষ্ণনগরে তিন ধরনের মৃৎশিল্পীদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান অঞ্চল ঘূর্ণী। এখানকার শিল্পীদের দক্ষতা সূক্ষ্ম বস্তুবাদী পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি গঠন এবং ভাস্কর্যে। কুমোরপাড়া বা ষষ্ঠীতলার সাধারণ স্তরের শিল্পীরা ছোট ছোট ছাঁচের পুতুল বানান। রাজবাড়ির কাছে নতুন বাজারের শিল্পীরা প্রধানত মূর্তিশিল্পী। দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি পরিকল্পনায় এখানকার রাজ পরিবারের ঐতিহ্য এখনও বজায় রেখেছেন। বর্তমানে এই শিল্পের অবস্থা খুব সঙ্গিন। এখানকার মৃৎশিল্পের যে কিংবদন্তীর মত খ্যাতি ছিল তা আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। এখানকার শিল্পীদের ছেলেরা তাদের বৃত্তি ছেড়ে অন্য কাজে চলে যাচ্ছেন। যাঁরা টিকে আছেন তাঁরা মাটির পুতুল বাদ দিয়ে পাথরের মূর্তি বানানোর কাজে চলে যাচ্ছেন। তাতে লাভ বেশি।
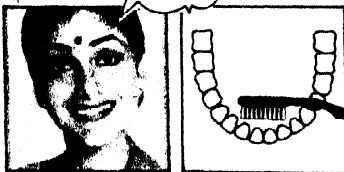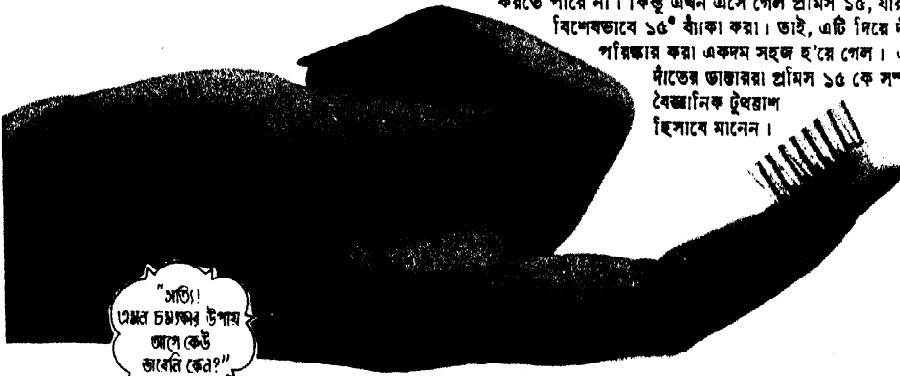
প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় কৃষ্ণনগরের অনুকরণ সর্বস্ব পুতুল ছাড়াও আহ্লাদী পুতুলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই পুতুল এক সময় যেমন কৃষ্ণনগরেও পাওয়া যেত, এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে দেখতে পাওয়া যায়। বীরভূমের আহ্লাদী পুতুলের যা গড়ন, মজিলপুরের গড়াই-এর অনেকটা একই গড়ন। মালদহ, নবদ্বীপে এক ধরনের মাটির পুতুল পাওয়া যায়—হাতির পিঠে কিংবা ঘোড়ার পিঠে বসা মূর্তি। স্থানীয় গ্রাম্য মেলায় সাধারণত এগুলি দেখতে পাওয়া যায়। পুতুলগুলোর নিচের অংশটা দেখা যায় না। ঘোড়া অথবা হাতির শরীরের সঙ্গে মিশে থাকে। এই পুতুলের সঙ্গে বাঁকুড়ার রেলপুতুলের কোথায় যেন মিল পাওয়া যায়। রেলপুতুল যেমন পোড়া মাটির, তাতে কোন রং-এর ব্যবহার নেই। কিন্তু এই পুতুলে সামান্য রঙের ব্যবহার হয়। সাদা অথবা হালকা বাসন্তী রঙের উপর তুলি দিয়ে মাথার পাগড়ি, গলার হার, জামার নকশা ও হাতের আঙুলের সাজেশান থাকে। স্থানীয় লোকেরা এই পুতুলকে ঘোড়া পুতুল, হাতি পুতুল বলে।

পুরুলিয়ার দীপাবলী পুতুলের সঙ্গে মেদিনীপুরের পরী পুতুলেরও অনেক মিল। পুরুলিয়ার বলরামপুর গ্রামে কয়েকঘর পরিবার দীপাবলী পুতুল তৈরি করেন। এঁরা নিজেদের বিহারী কুমোর বলে পরিচয় দেন। এঁদের পূর্বপুরুষ এক সময় গয়া-হাজারীবাগ থেকে এ দেশে আসেন। পুতুল গড়া ছাড়াও এঁরা সারা বছর মাটির টালি বা খাপড়া এবং হাঁড়ি-কলসি বানায়। দেওয়ালীর সময় এই সব পুতুলের হাতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

পরীপুতুল বা দীপাবলীপুতুলের মত মেদিনীপুর অঞ্চলে আর এক ধরনের পুতুল পাওয়া যায় যার নাম গয়লানী। এক হাত কোমরে, অন্য হাতে দুধের কেঁড়ে অথবা বাচ্চা ছেলে ধরে আছে। মাথায় মুকুটের পরিবর্তে চুড়ো করে চুল বাঁধা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মজিলপুরের মাটির পুতুলে এই ধরনের কোন গ্রোটেস্ক্ ফর্ম দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু বারা মূর্তি ছাড়া। অন্যান্য পুতুলে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যদিও সেই আধুনিকতা তার ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করেনি। এখানকার পুতুলের মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি বেশি প্রাধান্য পায়। যেমন বনবিবি, ওলাইচণ্ডী, বড় খাঁ গাজী, দক্ষিণরায়, নারায়ণী বারা বা আটেশ্বর ইত্যাদি।

এই সব মূর্তি ছাঁচে এবং হাতে গড়া দুই-ই হয়। লৌকিক দেবদেবী ছাড়াও পালা পার্বণ উপলক্ষে মেলাতে বিক্রির জন্য নানা রকম পুতুল পাওয়া যায়। যেমন রাধাকৃষ্ণ, গড়াই, নন্দ, মহাদেব, বেনে বৌ, জগন্নাথ, কলসি কাঁখে নিয়ে বৌ, মাছ মুখে বেড়াল, কুকুর, বাঘ ইত্যাদি। এই সব পুতুল ছাঁচের তৈরি। মাঝখানটা ফাঁপা। দুটো অংশ আলাদা ভাবে ছাঁচ তুলে জুড়ে দেওয়া হয়। দেবদেবী বাদে আর সব পুতুল পণে পোড়ান হয়।

কিছুদিন আগেও এ অঞ্চলের প্রবীণ শিল্পী মন্মথনাথ দাস জীবিত ছিলেন। ওঁর তৈরি পুতুলের মধ্যে বিখ্যাত হল রাধাকৃষ্ণ, জগন্নাথ, গড়াই, দক্ষিণরায় ও নারায়ণী মূর্তি। দক্ষিণরায় এবং নারায়ণী মূর্তির সঙ্গে কুচল কুম্ভকারদের বারা মূর্তির অনেকটা মিল। মাঘ মাসের প্রথম দিকে বারা ঠাকুরের পূজা হয়। এই মূর্তি দেখতে ঘটের মত। ঘটের উপরের একভাগ উঁচুর দিকে বাড়ানো। অনেকটা পাতার আকৃতি, এটাই দেবতার মুকুট। মুকুটের উপর তুলির আঁচড়ে লতাপাতা আঁকা। হরপ্পা-মোহেনজোদারোর শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষ মূর্তিটির সঙ্গে বারা ঠাকুর (মুণ্ডমূর্তি) বা দক্ষিণরায়ের গালপাট্টার এক আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
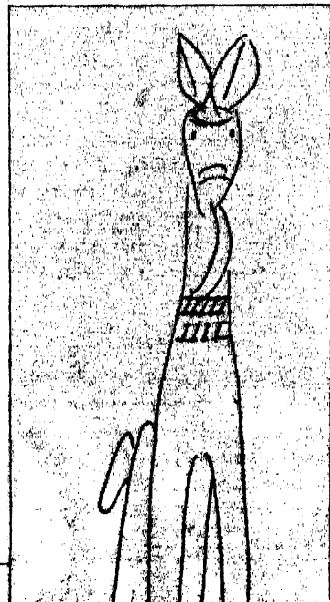
টেপা পুতুল

হাতির পিঠে রাজামশাই

ঘোড়া : পাঁচমুড়া

বনবিবির মূর্তি বারা ঠাকুরের মূর্তি মত অতটা বিমূর্ত নয়। ইনি ভক্তবৎসলা ও দয়াবতী। হিন্দু মুসলমান উভয়ের দেবী। তাই এঁর দু'রকম মূর্তি দেখা যায়। মুসলমান অঞ্চলে এঁর আকৃতি কিশোরী বালিকার মত। মাথায় টুপী, বিনুনি করা চুল, গলায় বন-ফুলের মালা, পরনে পিরান বা ঘাগরা পাজামা, পায়ে জুতো। এক হাতে আশাবাড়ি বা দণ্ড। কোথাও কোলে একটা বাচ্চা ছেলে দেখা যায়—বাহন মুরগী বা বাঘ।

হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বনবিবির আকৃতির সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, গলায় হার বা ফুলের মালা, সর্ব অঙ্গে অলংকার। হাতে কোন প্রহরণ বা আশাদণ্ড থাকে না। কোলে একটা শিশু।

আটেশ্বর অরণ্যরক্ষক বা পশুদের দেবতা। গায়ের রঙ নীল। মাথায় পাগড়ি, বাবরী চুলের কিছুটা দেখা যায়। মালকোঁচা মারা ধুতি। ডান হাতে একটা মুগুর, কানে মাকড়ি, গলায় হার। বাঁশ পাতার মত বড় বড় চোখ, বিশাল এক জোড়া গোঁফ।

কালুরায় ব্যাঘ্রদেবতা। দেহের রঙ সাদা অথবা হলুদ। মাথায় পাগড়ী, বাবরী চুল, কপালে তিলক, টিকলো নাক, চওড়া গোঁফ। এক হাতে

টাঙ্গি আর এক হাতে ঢাল। পিঠে তীরধনুক। বাহন ঘোড়া অথবা কুমীর।

ওলাইচণ্ডীর আরো নাম। যেমন ওলাবিবি, বিবিমা। ইনি ওলাওঠা রোগ নিবারণের দেবী। হিন্দু অঞ্চলে এঁর আকৃতি হল অতসী ফুলের মত হলুদ গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। মুখের গড়ন খুব সুন্দর। দাঁড়িয়ে বা বসে থাকেন। কখনও কোলে একটা শিশু দেখা যায়। হাতে বালা, গলায় হার, মাথায় মুকুট। পরনে নীল রঙের শাড়ি। মুসলমান অঞ্চলে পিরান পাজামা টুপি, ওড়না নাগরা জুতা পরা থাকে।

বড় খাঁ গাজী ইনি বনবিবি বা দক্ষিণরায়ের মত ব্যাঘ্র দেবতা। এঁকে অনেকে জিন্দাপীর বা গাজীসাহেব বলেন। এঁর গায়ের রঙ গোলাপী বা হলুদ। পরনে মুসলমানী চোগাচাপকান পিরান মাথায় টুপি বা পাগড়ি, মুখে লম্বা দাড়ি এবং গোঁফ। ইনি ঘোড়ার পিঠে বসে থাকেন। এক হাতে লাগাম আর এক হাতে আশাদণ্ড।

দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা। গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, কপালে রক্ততিলক, টানা টানা চোখ, পাকানো গোঁফ, লম্বা জুলফি। হিন্দু রাজাদের মত যোদ্ধার বেশ। হাতে তীর - ধনুক অথবা বন্দুক।

পাঁচুঠাকুর বা পেঁচোঠাকুর। ইনি শিশুরক্ষক, গায়ের রঙ কালো, ঝুঁটি বাঁধা চুল। কোন কোন জায়গায় মাথায় দু'খানা শিঙ দেখা যায়। চোখগুলো বড় বড়, কপালে তিলক। এঁর স্ত্রী পাঁচি ঠাকুরাণী স্বামীর সঙ্গে সর্বত্র পূজা পান। এঁর গায়ের রঙ হলুদ, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, সর্বাঙ্গে গহনা।

লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি তৈরি ক্রমশ কমে আসছে। এখনও যে সব জায়গায় পাওয়া যায় তার মধ্যে জয়নগর, মজিলপুর, বারাইপুর, শিবানীপুর, চৈতন্যপুর বড়িষা প্রভৃতি অঞ্চলে। এইসব পুতুল প্রতিমা যাঁরা তৈরি করেন তাঁরা জাতিতে পটিদার, সূত্রধর, মাহিষ্য কোথাও নিম্নবর্ণের হিন্দু।

এখানে আরো এক ধরনের পুতুল তৈরি হয়, পুতুল নাচের পুতুল। এক সময় কলকাতা এবং তার আশপাশে বসা-সঙ ও পুতুল নাচের খুব চল ছিল। সেকালে বিভিন্ন পূজা পার্বণে নানা ধরনের মাটির পুতুল দিয়ে সাজানো হত। তাকে বলত বসা-সঙ। যে সঙ কোন রকম নড়াচড়া করে না। জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পুতুল দিয়ে সাজানো হত। সেই সঙ্গে থাকত পুতুল নাচের পালা। এই পুতুল নাচের নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ও মালদহ জেলায় প্রচলন ছিল বেশি। এই কাঠের পুতুলের শিল্পীরা ছিলেন কর্মকার বা সূত্রধর গোষ্ঠীর। নরম কাঠ থেকে তৈরি হয় এই পুতুল। চব্বিশ পরগণার রাজবেড়িয়ায় কিশোরী কর্মকার এবং জয়নগরের সতীশ হালদার এখনও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পুতুলগুলো দুই থেকে আড়াই ফুটের মত লম্বা। কোমরের নীচের অংশ খোদাই করা হয় না। শুধু গলা কোমর কাঁধ কনুই-এর কাছে জোড় থাকে। পুতুল নাচের বাজিকরেরা এই পুতুল দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত এবং বিভিন্ন পৌরাণিক পালা দেখিয়ে থাকেন।

ঘোড় সওয়ার : পাঁচমুড়া
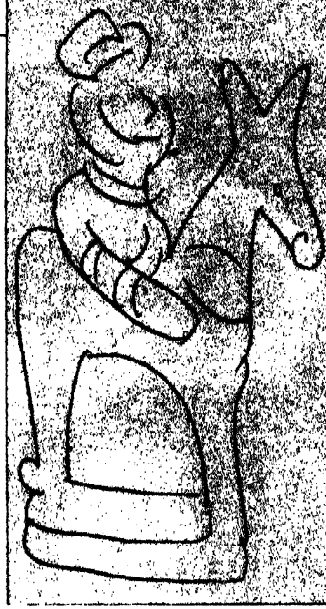
কাঠের পুতুল প্রসঙ্গে বলতে গেলে বর্ধমানের নতুন গ্রামের কথা প্রথমেই বলতে হয়। এখানে কয়েক ঘর সূত্রধর শিল্পী চিরাচরিত প্রথায় কাঠের পুতুল তৈরি করে আসছেন। লক্ষ্মী পেঁচা, শ্রীগৌরাঙ্গ, মমি পুতুল প্রভৃতি। এইসব পুতুল এক সময় কালীঘাটের মন্দিরের দু'পাশের দোকান গুলোতে প্রচুর বিক্রি হত। যার ফলে এগুলো কালীঘাটের পুতুল নামেই পরিচিত ছিল।

এই পুতুলগুলো সাধারণত আমড়া, জিওল, ছাতিম, শিমুল প্রভৃতি কাঠ থেকে খোদাই করে মূর্তির আদলে আনা হয়। তারপর রঙ লাগানো হয়। তুলির টানে চোখ মুখ ও কাপড়ের ভাঁজ আঁকা হয়।

পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের পুতুল তৈরি হয়। যেমন বর্ধমান জেলায় নতুনগ্রাম, দাঁইহাটি, পাটুলী, কাষ্ঠশালী, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হাওড়া জেলার থলে-রসপুর, মেদিনীপুর জেলার বক্সীবাজার, আনন্দপুর, ঝাড়বনী এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বেলতোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে। গড়বেতা, দাসপুর ও বক্সীবাজারের শিল্পীরা এই সব কাঠের পুতুলের সঙ্গে ছোট ছোট ঢেঁকি তৈরি করেন।

বাঁকুড়ার পুতুল যেমন ভাবপ্রধান বা Abstract তেমনি বীরভূমের গালার পুতুল অনেকটা এই রীতির। শান্তিনিকেতনের কাছে ইলামবাজার। একসময় গালার পুতুলের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার গালার পুতুল সারা বাংলায় পাওয়া যেত।

গোপাল শুঁই নামে এক দক্ষ গালা শিল্পীকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয়। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। শিল্পসদন প্রতিষ্ঠার পর গোপাল শুঁই শ্রীনিকেতনে এসে কাজ শুরু করেন। পরে এই বিভাগটির পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন সন্তোষ ভঞ্জ।

অনেকটা মাটির টেপা-পুতুলের মত আঙুলের চাপে গালার লেচিকে একটা রূপ দেওয়া হয়। মুখ হাত পা আলাদা আলাদা তৈরি করে সেগুলো পরে এক এক করে জুড়ে নেওয়া হয়। কাল লাল সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের গালার লেত্তি বা ফিতে দিয়ে পুতুলের মাথার চুল, গয়না বা শাড়ির পাড় তৈরি হয়।

মাটির পুতুলের থেকে কাঠ, গালা বা সোলার পুতুলের চাহিদা ক্রমশ কমে যাবার মূলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং রুচির অভাব। বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প শহরকে কেন্দ্র করে টিকে নেই। টিকে আছে অসংখ্য গ্রামীণ মানুষের লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে। গালার পুতুলের পিছনে সে-রকম কোন ধর্মের যোগ ছিলো না। তাছাড়া গালার দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে সাধারণ মানুষের কাছে এর চল কমে আসতে লাগলো। বর্তমানে যে গালার পুতুল পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ গালার নয়। মাটির টেপা পুতুলের উপর পাতলা গালার একটা প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

তালপাতার পুতুল। যার নাম তালপাতার সেপাই। এখন বলতে গেলে এটি দুর্লভ। বীরভূমের কয়েকটা অঞ্চলে এই পুতুল এক সময় পাওয়া যেত। এখনও হয়তো খোঁজ করঁলে পাওয়া যেতে পারে, তবে কোন নিশ্চয়তা নেই। কলকাতার আশপাশে কিছু কারিগর বাচ্চাদের খেলনা বা পুতুল বানায়। এরা একটা বাঁশের উপর খড় জড়িয়ে নানারকম পুতুল ও খেলনা সাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে। এদের কাছে কাপড়ের পাখি, কাগজের কুমীর মুখোস, পাটকাঠির সাপ, কখন কখন তালপাতার সেপাইও দেখতে পাওয়া যায়। শোলার পুতুলের অবস্থা অনেকটা একই রকম। যদিও সোলার থেকে পুতুল ছাড়াও প্রতিমা সাজাবার অনেক কিছু তৈরি হয় যার ফলে শোলা শিল্পীরা সেটাকে নির্ভর করে কোন মতে টিকে আছে। কলকাতার কুমোরটুলি নতুনবাজার বাগবাজারের মালাকারদের অবস্থা প্রায় একই রকম। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গের অনেক শোলা শিল্পীরা কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে উঠে এসেছে। উত্তর কলকাতায় রাস বা চৈত্র সংক্রান্তির সময় এই শোলার পুতুল দেখতে পাওয়া যায়। মোষের সিং বা হাতির দাঁতের পুতুলের সেই একই অবস্থা। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ও খাগড়া অঞ্চলে আজও হাতির দাঁতের পুতুল পাওয়া যায়। এক সময় নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পটির শুরু হয়েছিল। এঁরা বেশিরভাগ বৈষ্ণব। কৃষ্ণমূর্তি ছাড়াও নানা দেবদেবীর মূর্তি, নৌকো, জীবজন্তু প্রভৃতি তৈরি করেন।

বর্তমানে আমরা যেগুলোকে পুতুল বলছি তার বেশির ভাগ দেবদেবী অথবা কোন কাল্ট অবজেক্ট। এই লোকশিল্পের যে বিস্ময়কর সৃষ্টি তা মূলত নামগোত্রহীন। যাঁরা এই সব সৃষ্টি করেছেন তাঁরা কোন মৌলিকতা দাবী করেন না। তাঁরা বলেন একটা গোষ্ঠীর কথা। একটা প্রবহমান ঐতিহ্যের কথা।

অঙ্কন : সমীর বিশ্বাস ও প্রবীর সেন
ছবি : 'ফোক আর্ট অব বেঙ্গল' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত